মূলপাতা

শেকল

Shamsul Arefin Shakti

July 26, 2020

16 MIN READ

[ক] শেকল

উপনিবেশ আমল শুরু হবার আগে উসমানী-অধীন এলাকা (পূর্ব ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা), পশ্চিম আফ্রিকা (মালি, ঘানা, সেনেগাল, মৌরিতানিয়া) এবং উপমহাদেশে (পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান) একটা শক্তিশালী শিক্ষাব্যবস্থা ছিল। এই ক'টা এলাকার নাম বলার কারণ হল, এই ক'টা আমি পড়েছি। বাকি এলাকায় কী হালত মন্তব্য করছি না। সব এলাকার উদাহরণ এখানে দেবার অবকাশ নেই। সামনের বইগুলোতে কিছু কিছু করে প্রাসঙ্গিক আলোচনা থাকবে ইনশাআল্লাহ। শুধু এতটুকুবলি। উইলিয়াম হান্টার তার **'ইন্ডিয়ান মুসলমানস'** গ্রন্থে লেখেন—

> 'এ দেশটা আমাদের হুকুমতে আসার আগে মুসলমানরা শুধু শাসন ব্যাপারেই নয়, শিক্ষা ক্ষেত্রেও ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতি ছিল। ভারতের যে প্রসিদ্ধ (ইংরেজ) রাষ্ট্রনেতা তাদের ভালোভাবে জানেন, তাঁর কথায় : ভারতীয় মুসলমানদের এমন একটা শিক্ষাপ্রণালী ছিল, যেটা আমাদের আমদানি করা (বৃটিশ) প্রণালীর চেয়ে নিম্ন হলেও (!) কোনো ক্রমেই ঘৃণার যোগ্য ছিল না। তার দ্বারা উচ্চস্তরের জ্ঞান বিকাশ ও বুদ্ধিবৃত্তি পরিচ্ছন্ন হতো। সেটা পুরনো ছাঁচের হলেও তার ভিত্তিমূল সুদৃঢ় ছিল এবং সেকালের অন্য সব প্রণালীর চেয়ে নিঃসন্দেহে উৎকৃষ্ট ছিল। এই শিক্ষাব্যবস্থায়ই তারা মানসিক ও আর্থিক প্রাধান্য সহজেই অধিকার করেছিল।' [1]

সেই শিক্ষাটা কেমন ছিল একটু ধারণা করা যেতে পারে। উপনিবেশ শুরুর ঠিক আগের শতকে আওরঙ্গজেবের মেয়ে শাহজাদী যাইবুন্নিসার সিলেবাস ছিল আরবি গ্রামার, গণিত, যুক্তিবিদ্যা, দর্শন এবং অন্যান্য বিজ্ঞান সহযোগে। এটা ছিল ঘরে একটা অনানুষ্ঠানিক কারিকুলাম। এ থেকে আনুষ্ঠানিক কারিকুলামের একটা ধারণা নিতে পারি আমরা। **১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় ৮০ হাজার মক্তব ও মাদ্রাসা ছিল**[2], যেখানে উইলিয়াম হান্টারের বিবরণ অনুযায়ী ' **বৃটিশ কারিকুলামের মত না হলেও ঘৃণার যোগ্য ছিল না', বরং 'উচ্চস্তরের জ্ঞান বিকাশ ও বুদ্ধিবৃত্তি পরিচ্ছন্ন' হবার জন্য এবং 'মানসিক ও আর্থিক প্রাধান্য' অর্জনের উপযোগী ৮০ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল আমাদের ৩/৪ কোটি মানুষের জন্য**।

ফ্রান্সের নিষ্পেষণে নিঃস্ব আফ্রিকার সোনার দেশ, 'মানসা মুসা'র দেশ মালি। টিম্বাকতু শহরে ৩ টা ভার্সিটি, ১৬শ শতকে। **শহরে ১ লাখ আদিবাসীর মধ্যে ২৫ হাজার ভার্সিটি স্টুডেন্ট**। কুরআন-হাদিস-ফিকহ-সাহিত্য ছিল প্রধান বিষয়। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে থাকত—মেডিসিন-সার্জারি, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, ফিজিক্স, রসায়ন, দর্শন, ভাষাতত্ত্ব, ভূগোল, ইতিহাস, চিত্রকলা। ভার্সিটির সামনে বহু ট্রেড-শপ থাকত, ছাত্ররা এখানে হাতে কলমে ব্যবসা শিখত। এখানে কাঠের কাজ, কৃষি, মাছ ধরা, চামড়া শিল্প, সূচিকর্ম, নৌবিদ্যা শিখত।

শুরু হল সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ইউরোপের এক বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন, যার নাম Enlightenment। ইউরোপীয় দার্শনিকদের চিন্তায় এর ফলে **ঈশ্বর, যুক্তি, প্রকৃতি এবং মানবতার ধারণা নতুনভাবে তৈরি হয়**; যার সম্মেলনে গড়ে ওঠে এক নতুন worldview বা বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি। **এই দৃষ্টিভঙ্গি দ্রুত পশ্চিমে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে এবং শিল্প-দর্শন –রাজনীতির ছাঁচ গড়ে দেয়**। এই চিন্তাধারার কেন্দ্র হচ্ছে— যুক্তির প্রয়োগ। আর মানুষের মূল লক্ষ্য এখানে— জ্ঞান, স্বাধীনতা আর সুখ।[3] **এর আগে যে শিক্ষাটা ছিল তার উদ্দেশ্য ছিল— লিখতে-পড়তে পারা (promote literacy), শৃঙ্খলা শেখানো (mental discipline) আর নৈতিক চরিত্র গঠন (good moral character)**।

'এনলাইটেনমেন্ট'-এর যুগে ইউরোপ যখন 'খৃষ্টধর্ম-সামন্তসমাজ' (রাজতন্ত্র + পোপতন্ত্র) থেকে 'ধর্মনিরপেক্ষ-পুঁজিবাদ'

(গণতন্ত্র + পুঁজিপতি) সেট-আপে আসছে। নতুন করে সব কিছুর সংজ্ঞা ঠিক করা হচ্ছে। ব্যক্তি-সমাজ-রাষ্ট্র-ধর্ম- উদ্দেশ্য-সত্য-নৈতিকতা—সবকিছুর নতুন নতুন ধারণা দিচ্ছেন ইউরোপীয় দার্শনিকরা। পুরোপুরি ইউরোপীয় অভিজ্ঞতার আলোকে। **সুতরাং 'শিক্ষা'র সংজ্ঞাও বদলে গেল**। Encyclopedia Britannica বলছে—

The **new social and economic changes (এনলাইটেনমেন্ট)** also called upon the schools (public and private) to broaden their aims and curricula. Schools were expected not only to **promote literacy**, **mental discipline**, and **good moral character** (শিক্ষার আগের উদ্দেশ্য) but also to help prepare children for **citizenship**, for **jobs**, and for **individual development and success**. (পরের উদ্দেশ্য)

আগে শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল— লিখতে-পড়তে পারা (promote literacy), শৃঙ্খলা শেখানো (mental discipline) আর নৈতিক চরিত্র গঠন (good moral character)। আর এখন তার সাথে যোগ হল:

১. নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্য যোগ্য নাগরিক তৈরি (citizenship),

২. নতুন অর্থ-ব্যবস্থার (পুঁজিবাদী) জন্য কর্মী তৈরি যারা চাকুরিতে আসবে (jobs)

৩. নতুন সংজ্ঞার 'ব্যক্তি' তৈরি (individual development), যারা 'সফলতা'র নতুন সংজ্ঞার (material success) জন্য প্রস্তুত হবে। [4]

তাহলে 'নারীশিক্ষা' মানে কী দাঁড়াচ্ছে?

১. মেয়েদেরকে তাদের দেয়া রাষ্ট্র-কাঠামোর যোগ্য নাগরিক বানানো

২. পুঁজিবাদী অর্থ-ব্যবস্থার কর্মী বানানো

৩. 'ব্যক্তি' হিসেবে মেয়েদের তৈরি করা, যারা ধর্মকে ঝেড়ে ফেলে নিজের নৈতিকতার মাপকাঠি ঠিক করতে পারে। নিজেকে পশ্চিমাদের সংজ্ঞায় যেটা 'সফলতা' সেভাবে গড়ে তুলতে পারে। খ্যাতি-অর্থ-পদ-আধুনিকতার দাসে পরিণত হতে পারে।

'শিক্ষা' মানে 'নারীশিক্ষা' মানে যদি হয় 'এই', তাহলে ইউরোপের বাকি সব সংজ্ঞার মত, ঐ 'শিক্ষা' 'নারীশিক্ষা'র সাথেও ইসলাম একমত না। এই যে এদেশের বড় বড় আলিমগণ যে এই সেক্যুলার 'শিক্ষা' 'নারীশিক্ষা'র বিরুদ্ধে কথা বলেন, এবং শুরু থেকেই বলে এসেছেন— এই কারণে বলেন। আমরা না বুঝলেও আলিমরা ঠিকই বুঝেছিলেন, বৃটিশরা কী করতে যাচ্ছে।

দেশে দেশে উপনিবেশবাদ জেঁকে বসল। আশ্চর্যের বিষয়, আকাশ থেকে পড়ার মত বিষয়... ১০০টা বছর এই বিশাল উপমহাদেশ শাসন করেছে একটা প্রাইভেট কোম্পানি!!! যাদের লক্ষ্যই মুনাফা-সম্পদ-সোনা-টাকা। যাদের কোনো দায় নেই, কোনো পিছুটান নেই, কোনো দায়িত্ব নেই। ইংরেজরা সুবে বাংলার খাজনা আদায়ের দায়িত্ব পেয়ে লক্ষ্য করে যে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় ৮০ হাজার মক্তব ও মাদ্রাসা ছিল। এই ৮০ হাজার মক্তব, মাদ্রাসা ও খানকার জন্য বাংলার চার ভাগের এক ভাগ জমি লাখেরাজভাবে বরাদ্দ ছিল। ৪ ভাগের ১ ভাগ খাজনা হাতছাড়া হবে, তাই কি হয়?

ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানি ক্রমেই এই লাখেরাজ সম্পত্তি আইন, বিধিবিধান প্রণয়ন ও জোরজবরদস্তি করে দেশের হিন্দু জমিদার ও প্রজাদের ইজারা দিতে থাকে। এ-সংক্রান্ত তিনটি বিধান হলো :

(১) ১৭৯৩ সালের রেগুলেশন—১৯,
(২) ১৯১৮ সালের রেগুলেশন—২,

(৩) রিজাম্পসান ল' অব ১৮২৮ (লাখেরাজ ভূমি পুনঃগ্রহণ আইন) ।

ফলে মাদ্রাসার আয় কমতে থাকে। বহু মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে যায়। ১৭৬৫ সালে বাংলায় মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল আশি হাজার (Max Muller)। ২০০ বছর পর ১৯৬৫ সালে এ সংখ্যা দুই হাজারের নিচে নেমে আসে।'[5]

১৮৩০ সালের পর তাদের খেয়াল হল। কী খেয়াল? এই মূর্খ নেটিভদের শিক্ষিত করা দরকার— এই দয়া? জী না, জনাব। তাদের খেয়াল হল, **এই বিশাল দেশ শাসন করতে হলে আমাদের কিছু চামচা দরকার। যারা আমাদের আর এই বাদামি নেটিভদের মাঝে কথা চালাচালি করবে**। ১৮৩৪ সালে ভারতে শিক্ষা প্রসারের জন্য (?) কমিটি করা হয়। এর প্রধান ছিলেন লর্ড মেকলে। স্কীমের রিপোর্টে কমিটির উদ্দেশ্য হিসেবে লেখেন (কথাগুলা খেয়াল কইরেন)—

বর্তমানে এমন একটি শ্রেণী তৈরি করার জন্য আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা নেয়া উচিত, যারা আমাদের ও আমাদের মিলিয়ন মিলিয়ন প্রজাদের মাঝে ভাষ্যকার হিসেবে কাজ করবে। (উদ্দেশ্য শিক্ষার প্রসার না)

এরা হবে এমন একটা শ্রেণী, যারা রক্তে-গায়ের রঙে তো ভারতীয়, কিন্তু রুচি-মতামত-নীতি-বিচারবুদ্ধিতে হবে ইংরেজ। (মনোরাজ্যে উপনিবেশ)

এই শ্রেণীর কাছে আমরা দায়িত্ব দেব তাদের দেশী প্রচলিত কথাগুলোকে সংস্কার করার এবং পশ্চিমা পরিভাষা নিয়ে তাদের স্থানীয় ভাষাগুলোকে সমৃদ্ধ করার। (পশ্চিমা দর্শন-সংজ্ঞা-পরিভাষা গ্রহণ ও আত্মীকরণ)

তাদেরকে আমরা বাহন হিসেবে দেব বিভিন্ন ডিগ্রী, যাতে চড়ে তারা এই জ্ঞান পৌঁছে দেবে বাকি জনগণকে'।[6] (ডক্টরেট-নোবেল প্রাইজ-স্যার-রায়বাহাদুর-খানবাহাদুর)

পশ্চিমা শিক্ষা দর্শনের একটা উদ্দেশ্যই হল—

'to ensure that students acquire understandings about the great ideas of Western civilization. These ideas have the potential for solving problems in any era. The focus is to teach ideas that are everlasting, to seek enduring truths which are constant, not changing, as the natural and human worlds at their most essential level, do not change.

'পাশ্চাত্য সভ্যতার মহান ধারণাগুলো (এনলাইটেনমেন্ট থেকে পাওয়া) যেন বুঝিয়ে দেয়া যায় শিক্ষার্থীদের। **কেননা এই আইডিয়াগুলো চিরন্তন, ধ্রুব সত্য এবং সর্বযুগের সমাধান'**।[7] এভাবেই ইউরোপের নিজের অভিজ্ঞতা 'সার্বজনীন পরম সত্য' হিসেবে পুরো দুনিয়ার উপর চাপানোর এজেন্ডা নেয়া হল। যদিও ইসলামী ভূখণ্ডে, চীনের অভিজ্ঞতা ইউরোপ থেকে পুরোপুরি ভিন্ন। **উপনিবেশের মওকায় এভাবেই তারা সেই শ্রেণীটা তৈরি করে ফেলল, 'যারা চামড়ায় ভারতীয়, মগজে ইউরোপীয়'**।

যেহেতু **শিক্ষার সংজ্ঞা হল 'ইউরোপের বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি শেখা-ধারণ করা ও আত্মীকরণ করে চামড়ায় ভারতীয় মগজে ইউরোপীয় হওয়া'। এই সংজ্ঞায় যারা পড়বে তারা হল 'শিক্ষিত'**। আর যারা এই সংজ্ঞায় এলো না, তারা 'অশিক্ষিত', 'মূর্খ', 'প্রস্তর যুগের লোক', 'পশ্চাদপদ'। তারা কারা? তারা হল, যারা প্যারালাল শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে সেই আগেরটা লালন করে চলল। আপনারা দেওবন্দ আন্দোলন নিয়ে পড়েন, আপনাদের পায়ে পড়ি। উলামায়ে দেওবন্দ না হলে, আমরা সেই ১৯৬০-৭০ এর দশকের ফিলিস্তিনের মত একই সাথে বেপর্দা হয়ে যেতাম, ধর্মহীন হয়ে যেতাম। এই প্যারালাল শিক্ষাটা চালিয়ে নেবার জন্য হলেও উলামায়ে দেওবন্দকে প্রাপ্য সম্মানটুকু যেন দিই।

তো বৃটিশরা যখন ক্ষমতা দিয়ে গেল, কাদের কাছে দিয়ে গেল। এই 'চামড়ায় ভারতীয় মগজে বৃটিশ' দের হাতেই। এরাই আমাদের প্রেসিডেন্ট-মন্ত্রী-আমলা-শিক্ষক-বাবা-দাদা হলেন। তারাই আমাদের কারিকুলাম বানালেন, তারাই পলিসি করলেন,

তারাই পরস্পর যুদ্ধ করলেন। বলা হয় "দেশভাগ হয়েছিল 'ধর্মের ভিত্তিতে'। বাংলাদেশের জন্মই প্রমাণ করে দিল 'ধর্ম' কোথাও ভিত্তি হতে পারে না, ধর্ম ব্যর্থ"। বাজারে খুব চলে চেতনাটা। আচ্ছা, সেক্যুলার বৃটিশ দেশভাগ করল ইউনিকভাবে। দেশ দিয়ে গেল সেক্যুলারদের হাতে। যুদ্ধ করল সেক্যুলারে-সেক্যুলারে। বাঙালি মা-বোনদের ধর্ষণ করল পাক সেক্যুলার দেশের সেক্যুলার আর্মি। এই পুরো নাটকে 'ধর্ম', 'ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ'-এর দোষ কোথায়? সব রোল প্লে করল 'চামড়ায় ব্রিটিশ মগজে ইংরেজ'রা। দোষ হচ্ছে ধর্মের; মজা তো, মজা না?

সেই লর্ড মেকলের শিক্ষায় আমরাও 'শিক্ষিত'। তাই আমাদের মনে আজ কুরআন নিয়ে এতো প্রশ্ন, হাদিস নিয়ে প্রশ্ন, আলিমদের প্রতি এতো বিষোদ্গার, কুরবানীর সময় এলে উথলে-ওঠা প্রেম। খুব স্বাভাবিক। **ইউরোপীয় প্রতিটি দর্শন, প্রতিটি ধারণা, প্রতিটি সংজ্ঞা আমাদের মনে 'কুরআনের চেয়ে সত্য'**। লর্ড মেকলে-রা সফল। বংশ পরম্পরায় গোলামি করে চলছি, চলব। আর নিজেকে শিক্ষিত মনে করে চুকা ঢেকুর উঠতে থাকবে। আরাম লাগবে, আবার বুকও জ্বলবে। **লর্ড-মেকলের স্বপ্নের 'শিক্ষিত' আমরা যারা আছি, ইসলামকে ভালোবাসি, বুঝতে চাই; সবার আগে 'মেকলের ভূত' নামাতে হবে**। নইলে কুরআন-হাদিস-আলিম কিছুই হজম হবে না। আর এই ভূত নামাতে মরিচ-পোড়া হিসেবে কিছু বই আমাদের পড়তে হবে। কিছু প্রকাশিত হয়েছে, কিছু সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

-- চিন্তাপরাধ (আসিফ আদনান)
-- ইসলাম ও মুক্তচিন্তা (মুহাম্মদ আফসার উদ্দীন)
-- হিউম্যান বিয়িং (ইফতেখার সিফাত)
-- শাশ্বত দীন (শাকিল হোসাইন)
-- ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ২.০ (অধম) চাইলে পড়তে পারেন
-- হোমো স্যাপিয়েন্স (ডা. রাফান আহমেদ)

আর চেষ্টা করতে হবে পশ্চিমা সভ্যতাকে বুঝার। সেক্যুলারিজম-লিবারেলিজম-হিউম্যানিজম-সমতা-স্বাধীনতা-উন্নতি-প্রগতি এসব চমৎকার শব্দ বলতে ইউরোপ কী বুঝায়, কী শেখায়, কী চাপায়। ইউরোপীয় ইউনিয়ন আমাদের শিক্ষাখাতে লোন দিয়েছে। কারিকুলাম উন্নত করার জন্য। কী করবে তা বুঝাই যাচ্ছে। আমাদের সতর্ক হওয়া চাই। কমপক্ষে নিজেদের সন্তানদের ব্যাপারে সতর্কনা হলে কী হবে জানেন তো? আজ দেখলাম এক ছেলে তার তাবলীগী আমলদার বাবাকে মোটিভেট করেছে কুরবানি না দেবার ব্যাপারে। বাবা রাজি হয়েছে। এভাবেই মুরতাদ সন্তানদের হাতে নিজের ঈমান বিসর্জন দিতে না চাইলে জাগুন। এগুলো আলোচনা করুন। অনলাইনে-অফলাইনে আওয়াজ তুলুন, সতর্ক করুন।

[খ] শেকলের উপর শেকল

এখন অটোমেটিক একটা প্রশ্ন চলে আসে। আপনি যে বলছেন মুসলিমদের শিক্ষা ব্যবস্থা উপনিবেশের আগ অব্দি উন্নত ছিল। তাহলে আন্দালুসের জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা আমরা যেমন শুনি, এরপরে মুসলিম বিশ্বে তো এরকম বিজ্ঞানীর নাম শুনিনা। উসমানী খেলাফতে, মুসলিম ভারতে ইবনে সিনা, ইবনে হাইসাম, ইবনে রুশদ, জাহরাভীদের মত লোকজন পরে কেন পাই না। এক ভাই তো সেদিন উড়ায়েই দিল, 'ভাই শোনেন, ইতিহাসকে লুকিয়ে রাখা যায় না (তাই বুঝি?)। সত্যি যদি গ্রানাডার পতনের পর মুসলিম বিশ্বে বিজ্ঞান চর্চা হত, তাহলে দুই-একটা বিজ্ঞানীর নাম তো শুনতাম'।

প্রথমত

আমাদের কান যদি বন্ধক না দিতাম, তাহলে শুনতাম। আমাদের 'knowledge-presenter' হল ইউরোপ। ইউরোপ গবেষণা করে জ্ঞান উৎপাদন করে, মিডিয়ায় দেয়, আমরা শুনি, জানি। এই হচ্ছে আমাদের নলেজ-প্রসেস। **ইউরোপ আমাদের যেটুকু জানায়, সেটুকু আমরা জানি। যেটুকু লুকোয়, সেটুকু নিজে থেকে জেনে নেবার মুরোদ-ইচ্ছা-যোগ্যতা আমাদের নেই**।

আর ইউরোপ কখনোই উসমানী খেলাফতে আর মোগল আমলে কারা কারা বিজ্ঞান করেছে, সেটা আপনাকে গিলিয়ে দিয়ে যাবে না। **ইতিহাস বিজয়ী লেখে। ইতিহাস লুকোনো যায়। লুকোনো ইতিহাস বের করতে হলে গোলামি থেকে বের করতে হয় মগজকে**।

'উসমানী আমলে মোল্লাদের কারণে জ্ঞান-বিজ্ঞান হয়নি'- তীব্র সেক্যুলার কেমালিস্ট অটোমান-বিদ্বেষী ঐতিহাসিক **Adnan Adıvar** এবং **Aydın Sayılı**-এর লেখা থেকে তামাম দুনিয়া চাউর হয়েছে। উসমানীরা প্রেসের অনুমতি দেয়নি। কেন দেয়নি। শুধু ইস্তাম্বুলে ১ লাখ মানুষের রুজি হত 'অনুলিপি' করে। রাতারাতি পেটে লাথি দেয়া কীভাবে সম্ভব? **লুকিয়ে রাখা উসমানী বিজ্ঞানচর্চা ঠিকই বের করে এনেছেন প্রোফেসর Ekmeleddin İhsanoğlu. ৩০ বছর ধরে তোপকাপি মিউজিয়ামের লাইব্রেরি আর জার্মানি চষে ১৮ খণ্ডের Ottoman Scientific Literature তুলে এনেছেন**। আমার-আপনার মত 'না না সেসময় কিচ্ছু হয়নি' জিগির করলে আর জানা হত না আসলে কী হয়েছে। তাই নাম শোনেনি, এই দোষ সেসময়কার মুসলিমদের না। সেই দোষ আমাদের কান-মাথা বন্ধক রাখার।

দ্বিতীয়ত

আপনি শুধু বাগদাদ-আন্দালুসের বিজ্ঞানীদের নামই শুনবেন। কেন বলেন? কারণ ইউরোপ সরাসরি আন্দালুসের কাছে ঋণী, ডাইরেক্ট। বিজ্ঞানের 'সোকল্ড জনক' রজার বেকনকে তার লেখায় ২০০ বার 'ইবনে রুশদ'-এর নাম নিতে হয়। সার্জারির জনক Guy de Chauliac [মৃ.১৩৬৮] তাঁর গ্রন্থে ২০০ বারের বেশি কোট করেছেন জাহরাভী থেকে। জাহরাভী, আর-রাযী, আলী আব্বাসদের বই না পড়ে ৫০০ বছর সালের্নো মেডিকেল স্কুল, বোলোগনা ভার্সিটি, পদুয়া-নেপলস ভার্সিটিতে কেউ ডাক্তার হতে পারেনি। এইজন্য ইউরোপ দায় থেকে তাদের নাম উচ্চারণ না করে পারেনা।

নাম লুকোনোর কম চেষ্টা করেনি। আমি ল্যাটিনাইয করে আসল নাম বিকৃত করার কথা বলছি না। সে তো ভাষার সীমাবদ্ধতা, মেনে নিয়েছি। আমি যার কথা বলছি তাকে খাঁটি বাঙলায় বলে plagiarism, আরেকজনের কাজ নিজের নামে চালানো, জালিয়াতি। একজন স্বনামধন্য চোর হল মুরতাদ সেইন্ট Constantine the African. ইবনুল জাযযার-এর পুরো বিশ্বকোষ Viaticum সহ আরও কিছু তো ধরা পড়েছে। আর কত যে ধরা পরেনি, তার হিসেব কে রাখে। বহু কাজ কখনও পুরোটা, কখনও দুয়েক চ্যাপটার বেনামে, মূল লেখকের নাম ছাড়া, ল্যাটিন অনুবাদকের নামে পুনঃপুনঃমুদ্রণ হয়েছে। লিস্ট করছি দাঁড়ান। ইবনে নাফিসের ক্রেডিট কত শত বছর উইলিয়াম হার্ভে নিলেন। এরকম কতশত আবিষ্কারের কৃতিত্ব ইউরোপ কত বছর নিয়েছে, জানেন আপনি? ইউরোপীয় বিবেকবানরা দয়ামায়া করে জানিয়েছেন বলেই না জানতে পারছেন। তা নাহলে এই প্রশ্নও আপনার মুখ থেকে বেরোত— 'মুসলিমরা যদি আসলেই বিজ্ঞান করত কোনোকালে, তাহলে শুনলাম না কেন?'

এমনকি ইউরোপ এ-ও দাবি করেছে, মুসলিমরা আসলে কোনোকালেও বিজ্ঞান করেনি। স্রেফ গ্রীক-রোমান জ্ঞানকে অনুবাদ করে পাস করেছে, মৌলিক কাজ করেনি। যদিও দাবিটা ধোপে টেকেনি। যদি ধোপে টিকে যেত তবে আমার আপনার মত ইউরোপের গোলামরা একই সুরে গেয়ে উঠত: হ্যাঁ হ্যাঁ, মুসলিমরা নিজেরা কিচ্ছু করেনি, জাস্ট পাস করেছে। মোটকথা ইউরোপ যাদের কাছে সরাসরি ঋণী, তাদের নাম ছাড়া তারা আর কারও নামই বলবে না, আপনি শুনবেনও না।

ইউরোপ কখনোই জানাবে না, আন্দালুসের মতোই জ্ঞানবিজ্ঞানে এগিয়েছিল তিউনিসিয়ার কায়রাউইন। কারণ এখানকার বিজ্ঞানচর্চার সাথে তাদের সাধ নেই, দায় নেই। আমি জানলাম কীভাবে। চোর Constantine the African ইতালি থেকে এখানে এসেছিল পড়তে, তাই জানা গেল যে এই এলাকাও বিখ্যাত ছিল জ্ঞানে। বিশ্ব-ইতিহাসে প্রথম ভূত-প্রেতবিহীন মনোরোগের কিতাব এখানেই লেখেন father of psychiatry ইসহাক ইবনে ইমরান। De melancholia নামে চোরানুবাদ হয়েছে। আপনি কখনোই জানবেন না, **গ্রানাডার পতনের পর শত শত মুসলিম বিজ্ঞানী এসে আশ্রয় নেয় মরক্কোর ফেয ভার্সিটি, তিউনিসিয়ার কায়ারাউইন ভার্সিটি আর মিশরের কায়রোতে। শতশত ইহুদি এসে আশ্রয় নেয় ইস্তাম্বুল আর স্যালোনিকাতে উসমানী খেলাফতে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় তারা বিজ্ঞান চর্চা করতে থাকে**। কেননা এগুলোর কাছে

ইউরোপের বিজ্ঞানের কোনো দায় নেই। ইউরোপ তখন নিজেই জ্ঞানে স্বাধীন। তাদের তখন আর এদিকের বিজ্ঞানীদেরকে কোট করে বই লিখতে হয়নি। তাই আপনি আর এদের নাম জানবেন না, আর জিগির করবেন— 'হায়, আমরা বিজ্ঞান ছেড়ে দিয়েছি বলে এই অবস্থা'।

জ্ঞান-বিজ্ঞানে আমরা পিছিয়ে গেছি, এটা সত্য। তবে মোল্লারা আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ছাড়িয়ে দিয়েছে, এটা সত্য না। আন্দালুসের বহু কিতাব ইউরোপে চলে গেছে, মুসলিমরা জান নিয়ে পালিয়েছে। বিজ্ঞানে আমরা পিছিয়েছি এটা মিথ্যা না, এবং স্বাভাবিক। **তবে ইউরোপে ১৬৩৫ সালে ছাপানো বই তুর্কীরা পরেছে ১৬৫০-৬০, এতোটুকুই [৪]। ২০০ বছর পিছিয়েছে, এটা কেমালিস্ট প্রোপাগান্ডা**। বহু কিতাবপত্র তুর্কীতে অনুবাদ হয়েছে, তুর্কী ভাষা বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ডেভলপ করে বিজ্ঞানচর্চার ভাষায় রূপ নিয়েছে। বহু মুফতি জ্যোতির্বিদ্যা-মেডিসিন চর্চা করেছে। এগুলো ঘটেছে। কেমালিস্টদের মতো একতরফা খেলাফতকে দোষার কিছু নেই। এটা ইউরোপ আর তার গোলামেরা দুষবে, আর আপনি মুসলিম হিসেবে সত্যটা জানার চেষ্টা করবেন। এই বিজ্ঞানে ইউরোপের কোনো দায় নেই।

একইভাবে **মোগল আমলে কারা বিজ্ঞান করেছে, এটা কোনো হিন্দু বা ইউরোপীয় গবেষক এসে আমাকে খাইয়ে দিয়ে যাবে না। যোগ্যতা থাকলে আমরা বের করব। না পারলে চুপ থাকব, কমপক্ষে ইউরোপের জিগির না করার চেষ্টা করব। বলব না— 'কই, শুনলাম না তো'। 'না শোনা'টাকে নিজের দোষ মনে করি, ঐসময়ের বিজ্ঞানীদের দোষ না**। ইনশাআল্লাহ, সামনের বইয়ে এই বিষয়ে আলোচনা করার চেষ্টা থাকবে। **বিজ্ঞান আমরা করেছি, কিন্তু সেই বিজ্ঞান আমাদের বাঁচাতে পারেনি। পশ্চিমা বিজ্ঞানও আমরা শিখেছি। কারণ আমরা প্রযুক্তি নিতে গিয়ে তাদের 'সামাজিক বিজ্ঞান' নিয়ে এসেছি**। উসমানীরা যাদের বিজ্ঞান শিখতে পাঠিয়েছে, তারা ফ্রান্সে গিয়ে 'এনলাইটেনমেন্ট' শিখে এসেছে। ইয়ং তুর্কবানিয়েছে এসে। দীন-ধর্ম ভুলে, স্বকীয়তা ভুলে, ইউরোপের গোলাম হয়ে এসেছে। 'তানজিমাত' সংস্কারের নামে আল্লাহর বিধানকে দূরে ঠেলেছে।

প্রতিটা জায়গায় ওহী থেকে দূরে সরার কারণে আমরা হেরেছি। আন্দালুসের শাসকেরা, উসমানী শাসকেরা, মোগল শাসকেরা। খালদুনের মতে সভ্যতার সূচনা করে দুই শক্তি— ধর্মের সরলতা আর গোত্রশক্তির বেদুইনীয় সরলতা। ধীরে ধীরে এই সরলতা দূর হয়ে যায়, তার জায়গায় স্থান নেয় নগরজীবনের চাকচিক্য, ভোগবিলাস। সাদাসিধে জীবনের স্থানে চলে আসে বিলাসবহুল 'আয-যাহরা শহর', আল-হামরা, তাজ-মেহেল। আমি এগুলোকে কিছুটা আমাদের কলঙ্ক হিসেবে দেখি। J. D. Unwin –এর Sex And Culture-বই অনুসারে যৌনজীবন বিকৃত হয়ে পড়ে। আন্দালুসের একাধিক শাসকের নামে সমকামিতার অভিযোগ ওঠে। গান-বাজনা হয়ে ওঠে স্বতন্ত্র সাইন্স। মোগল শাসকদের জীবন হয়ে ওঠে ব্যভিচারীর জীবন। আলেক্সান্ডার হ্যামিলটন আওরঙ্গজেবের আমলে আসেন উপমহাদেশে। দক্ষিণ ভারতের কোনো এক শহরে মুসলিমদের এক অংশের কথা বলেন, যারা এক বিশেষ উৎসবের রাতে ঘুটঘুটে অন্ধকার করে দিত। যে যার বাড়িতে পারে গিয়ে শুয়ে পড়ত। কে কার মহিলার সাথে শু'লো, তার বালাই নেই। কখনও সখনো ইনসেস্ট হয়েও যেত, কী আসে যায়। বলেছেন শাহজাহানের 'সুন্দরীদের মেলা' আয়োজনের কথা। দীনের দেয়া **সরল সংযমী যৌনঅভ্যাসের জায়গা নিয়ে নিয়েছে অবাধ যৌন-সংস্কৃতি। আমাদের পতনের কারণ বিজ্ঞান ছেড়ে দেয়া নয়, ওহী ছেড়ে দেয়া।**

বৃটিশরা কীভাবে দুনিয়াজোড়া সাম্রাজ্য গড়লো। জ্ঞান-বিজ্ঞান? ওটুকুজ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ওসময় কী আমাদেরও ছিলো না? গান-পাউডারের যুগে আমরাও ছিলাম সেসময়। ভালো শিক্ষাদীক্ষাও ছিল, গত পোস্টে দেখিয়েছি। কেন আল্লাহ বৃটিশদের বেছে নিলেন আমাদের শায়েস্তা করতে সেই জবাব বোধ হয় পেয়ে গেছি প্রায়। সে আলাপ অন্য কোনোদিন। ইনশাআল্লাহ।

* * *

কখনও বোধ হয় বলিনি আমার কোনো পোস্ট শেয়ার করতে । আমার মন বলছে, এই পোস্ট ছড়িয়ে যাওয়া দরকার। নামে-বেনামে এই পোস্টের বার্তাগুলো শেয়ার করুন। আল্লাহ আমাদের বাঁচান।

রেফারেন্স:

[1] উইলিয়াম হান্টার, ইন্ডিয়ান মুসলমানস, পৃষ্ঠা-১১৬

[2] এ জেড এম শামসুল আলম, মাদ্রাসা শিক্ষা, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড, চট্টগ্রাম-ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ : মে-২০০২, পৃ. ৩-৪

[3] britannica.com/event/Enlightenment

[4] britannica.com/topic/education/Western প্রথম গল্পে 'ব্যক্তি'র পশ্চিমা সংজ্ঞার সাথে মিলিয়ে নিন।

[5] এ জেড এম শামসুল আলম, মাদ্রাসা শিক্ষা, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড, চট্টগ্রাম-ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ : মে-২০০২, পৃ. ৩-৪

[6] Minute on Indian Education,2nd February, 1935; Thomas Babington Macaulay, point 12.

[7] Perennialism দর্শন। [Philosophical Perspectives in Education,Oregon State University ওয়েবসাইট]

[8] Science, Technology and Learning in Ottoman Empire, Ekmeleddin İhsanoğlu.